ও৩ম্

নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা

অনুবাদ ও সম্পাদনা

শ্রী রঞ্জিত চন্দ্র

শিক্ষা ও শাস্ত্রার্থ সমন্বয়ক,
বাংলাদেশ অগ্নিবীর, রংপুর বিভাগীয় শাখা

॥ ওতম্ ॥

নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা

লেখক:-
জ্ঞানেশ্বরার্য (দর্শনাচার্য)

অনুবাদ ও সম্পাদনা:-
শ্রী রজিৎ চন্দ্র

বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

[সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে]

নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা

প্রকাশক : বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ
নতুন সংস্করণ : ১৬ জুন ২০২৫ ইং

লেখক : জ্ঞানেশ্বরার্য (দর্শনাচার্য)
অনুবাদ ও সম্পাদনা : শ্রী রজিৎ চন্দ্র

মূল্য : বিনামূল্যে ই-বুক কপি।

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

সম্পাদকীয়

যাঁরা সনাতনের মুখ্য ভিত্তি পবিত্র বেদের বিধানে ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাঁরা একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার'ই উপাসনা করে এবং তা অবশ্যই নিরাকার পরমাত্মার। বর্তমান সময়ে এই নিরাকার উপাসনা সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা হচ্ছে, জেনে অনেক ভালো লাগে। কারণ মানুষ ধীরে ধীরে তাঁদের গৌরবময় সুপ্রাচীন রীতিতে সনাতনকে ধারণ করছে। কিন্তু এই নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় একটা কমন প্রশ্ন "নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কীভাবে করবো?" —এই প্রশ্নের বিষয়ে যৌক্তিক উত্তর তথা শাস্ত্রীয় রেফারেন্স সহ এই পুস্তকটি প্রস্তুত করা হয়েছে। কেউ যদি নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা সম্পর্কে কোনো প্রকার বিভ্রান্তিতে থাকেন তবে এই পুস্তকটি হতে পারে তাঁর সমস্ত চিন্তার সমাধান।

আমি আশা করি, এই পুস্তকটি সকলের নিকট সমাদৃত হবে॥

— রজিৎ চন্দ্র

সূচীপত্র

নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান কীভাবে করবে?

ঈশ্বরের ধ্যানকারী সাধকের কাছে সব থেকে বড় সমস্যা এটা আসে যে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কিভাবে করা যায়? মনকে স্থির করার জন্য কোনো না কোনো আধার হওয়া আবশ্যক, সেই আধার কোনো মূর্তি হোক, কোনো প্রকাশ হোক, কোনো দীপ হোক, কোনো সুগন্ধি ধূপ হোক, কোনো বিন্দু হোক, বা কোনো চিহ্ন হোক। কোনো না কোনো বস্তু হওয়া আবশ্যক। বিনা কোনো আধারে মন কিভাবে স্থির হতে পারে? এই বিষয়ে ধ্যান প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে যে, মনকে স্থির করার জন্য আশ্রয়ের আবশ্যকতা তো রয়েছে, আমরাও বলছি যে আশ্রয় তো নেওয়াই দরকার কিন্তু সেই আশ্রয় ঈশ্বরেরই হওয়া আবশ্যক। আমাদের ধ্যান তো করতে চাই ঈশ্বরের কিন্তু আশ্রয় নিব প্রকৃতির, এটা তো ঝামেলা হয়ে গেল এইজন্য আশ্রয় তাঁরই নেওয়া উচিত যা ঈশ্বরই গুণ-কর্ম-স্বভাব।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ওজন, উচ্চতা, প্রস্থ এসব গুণ প্রকৃতির এবং প্রকৃতি দ্বারা নির্মিত পদার্থেও আসে, কিন্তু এসব গুলো ঈশ্বরের মধ্যে নেই। এর আশ্রয় আমরা যদি নেই, তো তা প্রকৃতির আশ্রয় হয়ে গেল। ঈশ্বরের আশ্রয় কিভাবে বলা যাবে এটাকেব? এখানে প্রকৃতির আশ্রয়কে গ্রহণ করে বলা হচ্ছে যে, ঈশ্বরের আশ্রয় নিচ্ছি। এরূপ মিথ্যা ধারণা হয়ে যাবে। ঈশ্বরের ধ্যান ঈশ্বরেরই আশ্রয় নিতে হবে। ঈশ্বরের আশ্রয় নেওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের গুণের আশ্রয় নেওয়া। ঈশ্বরের গুণ আনন্দ, ঈশ্বরের গুণ জ্ঞান, ঈশ্বরের গুণ বল, ঈশ্বরের গুণ দয়া, ঈশ্বরের গুণ ন্যায় ইত্যাদি। তো আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য এবং নিজ মনকে স্থির করার জন্য ঈশ্বরের গুণেরই আশ্রয় নেওয়া উচিত। সেই গুণ সমূহকে নিয়েই মনকে স্থির করা যায়, এবং ধ্যান করা যায়।

নিরাকারের আশ্রয়

যদি আমরা কোনো রূপের আশ্রয় করে ঈশ্বরের ধ্যান করি তো এটা ধ্যানই হবে না, বরং সেখানে বৃত্তি হচ্ছে। কেননা রূপ নেত্রের বিষয় এবং আমরা নেত্র দ্বারা রূপকে দেখে বৃত্তি করছি, বমত্তি নিরোধ কিভাবে হতে পারে? ঈশ্বরের ধ্যান করার জন্য বৃত্তি-নিরোধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ মনের মাধ্যমে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, যে প্রাকৃতিক বিষয় রয়েছে, ৫ ভূত রয়েছে – শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সেগুলো আমরা গ্রহণ করবো না। যদি ধ্যানের কালে রূপের অনুভূতি করা হয় তো বৃত্তি নিরোধ হবেই না, সেখানে তো বৃত্তি চলমান রয়েছে। সেই বৃত্তিকেই রুদ্ধ করেই ঈশ্বরের ধ্যান হতে পারে, এইজন্য রূপের আশ্রয় নিষেধ। এই প্রকার যদি আমরা শব্দের আশ্রয়

নিয়ে ঈশ্বরের ধ্যান করি, তো তাও নিষেধ। কেননা সেটিও ইন্দ্রিয়ের বিষয়। এটা আবশ্যক যে, আমরা উপাসনার সময় বৃত্তির নিরোধক করবো। আমরা ধ্যান করতে যাচ্ছি ঈশ্বরের, কিন্তু প্রকৃতির আশ্রয় নিয়ে প্রকৃতির ধ্যানে যুক্ত হয়ে যাই, এটা উচিত নয়। তাই উপাসনা কালে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গুণযুক্ত প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়।

সাকার ঈশ্বরের মিথ্যা ধ্যান

যে গুণ ঈশ্বরের মধ্যেই নেই, সেই গুণসমূহকে ঈশ্বরের মধ্যে মনে করে ঈশ্বরের ধ্যান করি বলেই তো আমাদের ধ্যান মিথ্যা হয়ে যায়। উদাহরণের জন্য যখন ঈশ্বরের মধ্যে 'রূপ' গুণই নেই এবং আমরা নিজের কল্পনা থেকে ঈশ্বরের মধ্যে লাল, নীল, সোনালী, সাদা বা অন্য কোনো প্রকারের গুণ রয়েছে এইরকম কল্পনা করে ঈশ্বরের ধ্যান করি তো এটাকে ধ্যান বলা হবে না, এটা তো অধ্যান হয়ে গেল, মিথ্যাধ্যান হয়ে গেল। এইজন্য যে ব্যক্তি কোনো রূপের আশ্রয় নিয়ে ধ্যান করে যে, আমি ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করবো, ঈশ্বর ধ্যান করবো, তো এটি কখনো ধ্যান হবে না। কেউ বিন্দুরূপে, কেউ সূর্যের রূপে, কেউ তারার রূপে, কেউ ধূপ বাতির শিখার রূপে, মোমবাতির শিখার রূপে, কেউ জ্যোতির রূপে, কেউ প্রকাশের রূপে, চোখ খুলেও কিছু লোক, চোখ বন্ধ করেও নিজের মনের ভেতর এই প্রকারের কল্পনা করে ঈশ্বরের ধ্যান করে, এইসব আশ্রয় ঠিক নয়। এটি একটি মিথ্যা মান্যতা যে, ঈশ্বরের ঈশ্বরের ভেতর কোনো জ্যোতি বা প্রকাশ রয়েছে। এর কারণ এই যে, লোকেদের ধারণা রয়েছে বা কোথাও শুনেছে, পড়েছে যে, ঈশ্বর প্রকাশমান এবং যখন তাঁর অনুভূতি হয় তো মহান প্রকাশ হয়। বেদ আদি আর্ষ গ্রন্থে ঈশ্বরের বিষয়ে আসা শব্দ প্রকাশ শব্দের অর্থ পার্থিব প্রকাশ নেওয়া উচিত নয়। প্রকাশের অর্থ জ্ঞান নেওয়া উচিত। যখন ঈশ্বরের অনুভূতি হয় তো ব্যক্তি মহান জ্ঞানী হয়ে যায়। এইরূপ মান্য করা উচিত। প্রকাশের অর্থ সেখানে জ্ঞান। ঈশ্বর প্রকাশবান এর অর্থ মহান জ্ঞানবান, পার্থিব প্রকাশবান নয়। এইজন্য ঈশ্বরের ভেতর প্রকাশের, জ্যোতির, সূর্যের, চন্দ্রমার, প্রদীপ আদির কল্পনা করে তাঁর ধ্যান করা উচিত নয়। যদি করা হয় তো এটি ধ্যান নয় বরং অধ্যান বলে অভিহিত হবে।

ঈশ্বরের গুণের দ্বারা ঈশ্বরের ধ্যান

প্রশ্ন আসে যে, যখন ঈশ্বরের মধ্যে রূপ আদি গুণ নেই তো তাঁর ধ্যান কিভাবে করা যায়? এর সোজাসুজি উত্তর এই যে, হ্যাঁ, নিরাকারেরও ধ্যান হয়। আমরা সকল নিরাকার বস্তুসমূহেরও ধ্যান করি। উদাহরণের রূপে বায়ু কি কেউ দেখতে পায়? বায়ুর কোনো রূপ নেই,

তার কোনো লাল, নীল, সোনালী রঙ নেই। বায়ু নিরাকার কিন্তু আমরা বায়ুর ধ্যান করি। বায়ুর অনুভূতি করি। প্রশ্ন আসে যে, কিসের মাধ্যমে বায়ুর অনুভূতি করি? উত্তর হলো যে, বায়ুর গুণের মাধ্যমে বায়ুর অনুভূতি করি যেরূপ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে তো আমরা অনুভূতি করবো বায়ু ঠাণ্ডা। বায়ু গরম হলে আমরা গরমের মাধ্যমে বায়ুর অনুভূতি করে নেই। ঠিক এইরকমই ঈশ্বরে রূপ আদি গুণ নেই কিন্তু তাঁর মধ্যে অনন্ত গুণ রয়েছে যেমনঃ দয়া গুণ রয়েছে, ন্যায় গুণ রয়েছে ইত্যাদি। এই গুণের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ধ্যান করতে পারি, করা উচিত। যেরূপ, হে ঈশ্বর ! আপনি ন্যায়কারী, দয়ালু, সৃষ্টির রচয়িতা, সৃষ্টির রক্ষক, পালক এবং পোষক। হে ঈশ্বর ! আপনি মহান জ্ঞানী, মহান দয়ালু, কর্মফল প্রদাতা ইত্যাদি।

নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যানের অন্য উদাহরণ

অন্য উদাহরণ শব্দের। আমরা শব্দকে স্বয়ং বলি, অন্যের শব্দকে শুনি। শব্দ থেকে জ্ঞান হয়ে যায়। শব্দের কোনো রূপ নেই। শব্দ কোনো লাল, নীল, সোনালী হয় না। শব্দ গুণ, সেই গুণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কোন ব্যক্তি বলছে। টেলিফোনে আমরা কথা বলি। আমাদের পরিচিত ব্যক্তি দ্বারা হ্যালো বলতেই আমাদের অনুভূতি হয়ে যায় যে, সে বলছে। এই প্রকার দ্বিতীয় উদাহরণ নিন। আমরা লতা মঙ্গেশ্বরকে, তাঁর নাম নিয়ে তাঁর দ্বারা গাওয়া গানকে শুনেছি। কোথাও থেকে লতার গান আসছে। সেখানে না বলার পরেও আমরা জানি লতা গাইছে। তার স্বরকে শুনে তাঁকে বুঝে নেই। এই প্রকার কিশোর কুমার গাইছে বা মোহাম্মদ রফী গাইছে বা অনুরাধা গাইছে। আমরা কপবল শব্দকে শুনেছি রূপকে দেখিনি যেরূপ আমরা শব্দ গুণের মাধ্যমে গায়ককে জেনে নেই তেমনি আনন্দ, জ্ঞান, বল, দয়া, পুরুষার্থ, ন্যায় আদি যে গুণ ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে সেই গুণ সমূহের মাধ্যমে সেই ঈশ্বরকে জানতে পারি, তার অনুভূতি করতে পারি, এটিই প্রক্রিয়া।

নিরাকার বস্তুরও ধ্যান সম্ভব

ঈশ্বরের উপাসনাকারী অনেক মানুষের মনে এই শঙ্কা থাকে যে, রঙ, রূপ, আকৃতি, দৈর্ঘ্য, প্রস্থহীন কোনো বস্তুর ধ্যান করা সম্ভব নয়। কোনো না কোনো রূপ থাকা অবশ্যই উচিত। কোনো ভিত্তি ছাড়া মনকে কিভাবে স্থির রাখা যাবে? অন্তত মনকে স্থির করার জন্য কোনো না কোনো ভিত্তি থাকা উচিত এবং সেই ভিত্তি হতে পারে মাত্র আকৃতিসম্পন্ন বস্তুই। তাই তারা কোনো জড় বস্তুকে আশ্রয় নেয়, কিন্তু এই মান্যতা সঠিক নয়। রঙ, রূপ, আকৃতি ছাড়া বস্তুরও

ধ্যান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সুখের কোনো রঙ, রূপ, আকৃতি নেই, তবুও প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ সুখের ধ্যান করে, সুখ কামনা করে। একইভাবে দুঃখেরও কোনো হাত পা নেই, তবুও সব প্রাণী দুঃখের ধ্যান করে এবং মনে মনে ভাবে দুঃখ যেন না আসে। একইভাবে গুরুত্বাকর্ষণ শক্তি, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, আলফা, বিটা, গামা এবং এক্স-রে ইত্যাদিও নিরাকার, এদের কোনো রূপ, রঙ, আকৃতি নেই, তবুও আমরা এগুলোর ধ্যান ও চিন্তা করি। তাই এটি অপরিহার্য নয় যে শুধু রূপবান বস্তুরই ধ্যান হয়, রূপহীন বস্তুর ধ্যান হয় না। প্রকৃত তত্ত্ব হলো যে, যেই বস্তুতে যেই গুণ থাকে, সেগুলোর মাধ্যমে সেই বস্তুর ধ্যান করা হয়, অন্যথা নয়। যখন ঈশ্বরে রঙ, রূপ, আকৃতি, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ওজন, তার হাত পা কিছুই নেই, তখন ঈশ্বরের ধ্যান করতে গিয়ে রঙ, রূপ, আকৃতি, হাত, পা ইত্যাদি ধারণা করা মিথ্যা এবং অর্থহীন। এমন ধ্যান থেকে ঈশ্বরের প্রাপ্তি কখনোই সম্ভব নয়, কারণ এই গুণগুলি ঈশ্বরে নেই।

নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার প্রমাণ

"স পর্যগাৎ শুক্রম্ অকায়ম্ " (যজুর্বেদ ৪০/৮) এই মন্ত্রে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর প্রত্যেক কণায় কণায় পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং শরীর ধারণ করেন না। ***"ন তস্য প্রতিমা অস্তি "*** (যজুর্বেদ ৩২/৩) এই মন্ত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী ঈশ্বরের কোনো মূর্তি হতে পারে না। একইভাবে বেদান্ত দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্থ সূত্রে ঋষি বলেছেন— ***"ন প্রতীকে ন হি সঃ "*** অর্থাৎ জড় পদার্থে, মূর্তি ইত্যাদিতে পরমাত্মার বুদ্ধি কল্পনা করা উচিত নয়। কারণ সেই জড় পদার্থ পরমাত্মা নয়। যদিও সেই পদার্থে ঈশ্বর আছে, তবুও সেই জড় পদার্থ ঈশ্বর নয়, তাই সেই জড় পদার্থকে ঈশ্বর ধরে তার উপাসনা করা উচিত নয়। একইভাবে সাংখ্য দর্শনে একটি সূত্র এসেছে— ***"ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ "*** (৬/২৫) এতে ঋষি বলেছেন যে ধ্যানের সময় মন কোনো লৌকিক বিষয়ের ওপর আসক্ত থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ যা ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সেগুলোর চিন্তা করা উচিত নয়। যখন আমরা কোনো জড় পদার্থের রঙ, রূপ, আকৃতি ইত্যাদির ধ্যান করি, তখন সেই বস্তু ধ্যানের বিষয় হয়ে যায়। তাই এখানে ঋষিরা ধ্যানের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে জড় পদার্থকে নিয়ে ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত নয়। উপরের বেদ, দর্শন ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখিত মন্ত্র ও সূত্র থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বর নিরাকার। ঈশ্বরের যে গুণ আছে, শুধুমাত্র সেই গুণের মাধ্যমে ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত। এই ধ্যান থেকেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ঘটে এবং ঈশ্বরের সেই গুণ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে অন্য কোনো আলম্বনকে মনে রেখে ধ্যান করলে তা ধ্যান নয়, অধ্যান হয়। এইরূপই বুঝতে হবে।

নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যানের উদাহরণ

কেউ আমাদের পরিচিত বন্ধু রাতের সময় আমাদের বাড়িতে আসে। কুশল বিনিময় করার পর যখন মূল উদ্দেশ্যের কথা আসে, তখন সে আমাদের বলে যে আমি আপনার কাছে ৫০ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম, তা ফেরত দিতে এসেছি। এমন বলেই সে পিছনের পকেটে হাত দিয়ে টাকার প্যাকেট বের করতে গিয়ে পায় না এবং উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, আমার পার্স কোথায় গেল? আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি, কী ব্যাপার? কোন পার্স? তখন সে উত্তর দেয়, আমি আপনাকে ৫০ হাজার টাকা ফেরত দিতে এসেছি। সেই টাকা এই পার্সে ছিল। জানি না কোথায় পড়ে গেছে? আমরা জিজ্ঞেস করি, শেষবার কোথায় দেখেছিলেন? তখন সে বলে, যখন আমি বাস থেকে নামলাম এবং রিকশায় উঠছিলাম, তখন প্যান্টের পিছনের পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করেছিলাম। কিছু টাকা রিকশাওয়ালাকে দিতে বের করে পার্স পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। তখন আমার পকেটে পার্স ছিল এবং টাকাও ছিল। আমরা জিজ্ঞেস করি, পার্সের রঙ, আকৃতি কেমন? তখন সে বলল, লাল রঙের পার্স, প্রায় ৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩ ইঞ্চি চওড়া। তাতে ৫ শত টাকার ১০০টি নোট রাখা ছিল। তখন আমরা বললাম, চলুন যেখানে আপনি বাস থেকে নেমেছিলেন এবং রিকশায় উঠেছিলেন, সেই জায়গায় যাই। সেই স্থান প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে ছিল। রাতের সময়, রাস্তা নির্জন ছিল। হাতে টর্চ নিয়ে পার্স খোঁজার জন্য আমরা বের হলাম। যদিও আমরা পার্স দেখিনি, তবুও আমাদের পরিচিত বন্ধু পার্স সম্পর্কে যেমন বর্ণনা দিয়েছিল, সেই বর্ণনার ভিত্তিতে আমরা অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে পার্স খুঁজতে শুরু করলাম। আমাদের মনে কেবল শব্দ জ্ঞান ছিল যে লাল রঙের পার্স, ৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি চওড়া, যাতে ৫০০ টাকার ১০০টি নোট ভরা আছে। মনে আর কোনো চিন্তা নেই, কেবলমাত্র বন্ধুর বলা পার্সের শব্দ জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা পার্স খুঁজছি এবং রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা ছিল সেই অপ্রত্যক্ষ পার্সের ধ্যান। ঈশ্বরের ধ্যানের অবস্থাও এমনই হয়। বেদের মন্ত্রে আসা ঈশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাব মনে মনে আওড়াতে থাকা এবং তাঁর প্রাপ্তির কামনা করতে থাকাকে ধ্যান বলা হয়। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার ৩টি বিভাগ আছে –

১. ঈশ্বরের স্তুতি

২. ঈশ্বরের থেকে প্রার্থনা

৩. ঈদের উপাসনা

সর্বপ্রথম বেদ-মন্ত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের স্তুতি করা হয়। স্তুতির অর্থ হলো কোনো বস্তুর স্বরূপ অর্থাৎ গুণ-কর্ম-স্বভাব ভালোভাবে জানা, যেমন ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, ঈশ্বর করুণাময়, ঈশ্বর মহান জ্ঞানী, ঈশ্বর মহান, বলবান ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিভাগ হলো প্রার্থনা। ঈশ্বরের যেসব গুণ আমরা বেদ-মন্ত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, সেই গুণগুলো অর্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করাই প্রার্থনা বলা হয়। যেমন, হে ঈশ্বর! আপনি আনন্দস্বরূপ, আমাকেও আনন্দিত করুন। আপনি মহান জ্ঞানী, আমাকেও জ্ঞানী করুন। আপনি মহান করুণাময়, আমাকেও করুণাময় করুন। আপনি ন্যায়পরায়ণ, আমাকেও ন্যায়পরায়ণ করুন ইত্যাদি।

ধ্যানের তৃতীয় বিভাগ হলো উপাসনা। ঈশ্বরের যেই গুণকে জ্ঞাত হয়ে আমরা তাঁর প্রাপ্তির প্রার্থনা করেছিলাম সেই গুণকে ধারণ করে নেওয়া অথবা করার সতত প্রয়াস করতে থাকাকে উপাসনা বলে।

স্তুতি, প্রার্থনার পর উপাসনার উদাহরণ

হে ঈশ্বর ! আপনি আনন্দস্বরূপ এইরূপ মান্য করাই ঈশ্বরের স্তুতি। হে ঈশ্বর ! আমিও আনন্দিত হয়ে যাব, এইরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করা প্রার্থনা। এবং আমি আনন্দিত হয়ে গেছি অথবা আমি দিনভর আনন্দিত থাকবো, দুঃখী হবো না এইপ্রকার প্রয়াস করা উপাসনা। উপাসকের জন্য কিছু মহত্ত্বপূর্ণ কথা:-

"মনুষ্য জীবনের পরম লক্ষ্য ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করা তথা অন্যদেরকে প্রাপ্ত করানো।" এই কথা যোগ জিজ্ঞসীদের নিজের মনে নিশ্চয় সহিত বসিয়ে নেওয়া উচিত। যেরূপ বেদাদি সত্য শাস্ত্রে লেখা রয়েছে —

১) ***বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্....*** [যজুর্বেদ ৩১/১৮]

২) ***ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।*** [কেনোপনিষদ ২।৫]

৩) ***আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।***

[বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৪।৫]

যোগাভ্যাসীকে যম নিয়মসমূহের পালন মন, বচন এবং শরীর দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে হবে। সাধক নিজে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহযোগিতা করবে।

যোগাভ্যাসীকে মহর্ষি ব্যাসের মতে এই কথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, "নাহতপস্বিনো যোগঃ সিদ্ধ্যতি" অর্থাৎ, তপস্যা ছাড়া যোগ সিদ্ধি হয় না।

যোগ সাধককে উচিত যে তিনি বেদ, দর্শন, উপনিষদ, স্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থের শব্দ-প্রমাণে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে চলবেন। এই আপ্ত কথাগুলোতে কখনো সন্দেহ করবে না।

যোগাভ্যাসীকে উচিত যে তিনি আচরণে এতটাই সতর্ক থাকবেন যে, কোনো ধরনের ত্রুটি (দোষ) ঘটতে দেবেন না। যদি কখনো ত্রুটি ঘটে, তবে তা দ্রুত স্বীকার করবেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করবেন (শাস্তি গ্রহণ করবেন) এবং ভবিষ্যতে যেন তা না ঘটে সে চেষ্টা করবেন।

যোগাভ্যাসীকে ভাষার ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে, অর্থাৎ প্রয়োজন হলে কেবল কথা বলবে, সত্যই বলবে, সত্যও মধুর ভাষায় বলবে এবং তা অবশ্যই উপকারী হতে হবে।

যোগাভ্যাসীকে নিজের সম্মানের ইচ্ছা কখনো করা উচিত নয় এবং অপমান সহ্য করতে হবে (দুঃখিত হওয়া যাবে না)।

যোগ সাধককে তার প্রতিটি কাজ ঈশ্বরের প্রাপ্তি (সাক্ষাৎকার) এর জন্য করতে হবে, সংসারিক সুখ এবং সুখের উপকরণের জন্য করবে না।

যোগাভ্যাসীকে ব্রহ্মবিদ্যা (যোগবিদ্যা) শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং সাক্ষাৎকারের পদ্ধতিতে অর্জন করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করবে।

সাধককে উচিত যে তিনি শুধুমাত্র যোগ সম্পর্কিত বিষয়েরই অধ্যয়ন করবেন, পড়া বিষয়গুলোর উপরই আলোচনা, চিন্তা করবেন। অন্য কোনো সংসারিক বিষয়ে আলোচনা করবেন না।

যোগাভ্যাসীকে উচিত যে তিনি ব্রহ্মবিদ্যার গুরুত্ব বুঝবেন এবং তা অর্জনের জন্য নিজেকে যোগ্য করবেন, যেমন জনক প্রভৃতি রাজারা ছিলেন। রাজা জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে নিম্নলিখিত কথা বলেছেন—

"সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দস্যায়োতি "

[বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪।৪।২৩]

"হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমি আপনাকে আমার সমগ্র বিদেহ রাজ্য অর্পণ করছি এবং নিজেকেও আপনার আদেশ পালন করার জন্য নিবেদিত করছি।" যোগাভ্যাসীর উচিত যে নিজে কষ্ট সহ্য করে (নিজের সুখ-সুবিধা ত্যাগ করে) অন্যদের সুখ দেওয়ার চেষ্টা করবে।

যোগাভ্যাসীকে অন্যদের গুণগুলোই দেখতে হবে, দোষ নয়, এবং নিজের দোষগুলো দেখতে হবে, গুণ নয়।

ভৌতিক বস্তুসমূহ (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যানবাহন ইত্যাদি) ব্যবহার করতে হবে শুধুমাত্র শরীরের রক্ষা করার জন্য, সুখ লাভের জন্য নয়।

যোগ সাধককে উচিত, যখন প্রয়োজন না থাকে তখন খাদ্য গ্রহণ না করা এবং প্রয়োজন পূর্ণ হলে খাদ্যাদি অতিরিক্ত গ্রহণ না করা অর্থাৎ নিজের জিহ্বা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা।

ঈশ্বরের দ্রুত প্রাপ্তির জন্য যোগাভ্যাসীকে উচিত যে, হেয়, হেয়-হেতু, হান, হানোপায় (দুঃখ, দুঃখের কারণ, সুখ, সুখের উপায়) এই বিষয়গুলোকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করা।

যোগাভ্যাসীর মনে যদি যোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে তাঁর উচিত যে কোনো যোগনিষ্ঠ গুরুর কাছে গিয়ে, তাঁদের অনুমতি নিয়ে, প্রেমপূর্ণ ও জিজ্ঞাসু মনোভাব নিয়ে

সেই সন্দেহগুলো সমাধান করা, কিন্তু কারো সঙ্গে বিতর্ক বা ঝগড়া করা উচিত নয়।

ধ্যানের সজ্জা

ঈশ্বরের উপাসনা করা "যোগাভ্যাসী"-কে অবশ্যই প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে উঠতে হবে। সাধকের উচিত বিছানা থেকে উঠার সময় মনে "ও৩ম্" স্মরণ করা। এরপর হাত-মুখ ধুয়ে উষঃপান (জল পান) করা। জল পান করার পর প্রাতঃকালের পাঁচটি বেদমন্ত্র "প্রাতরাগ্নি প্রাতরিন্দ্রং হবামহে..." ইত্যাদি অর্থসহ পাঠ করা।

তারপর শৌচ (প্রাকৃতিক কাজ), দাতুন করা, ব্যায়াম এবং স্নান করা। এরপর কোনো শান্ত, একান্ত ও পবিত্র স্থানে পরিষ্কার ও মোটা আসনে ধ্যানের জন্য বসা এবং ধ্যানাত্মক আসন (যেমন পদ্মাসন) থেকে সহজে (কষ্ট ছাড়াই) যে কোনো একটি আসন গ্রহণ করা। সমস্ত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে স্থির হয়ে সোজা বসা, অর্থাৎ মাথা, গলা ও কোমর—এই তিনটি যেন সোজা হয়, এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া।

আসনে বসার পর "মানব জীবনের লক্ষ্য কী?" অথবা "আমাকে এই মানব শরীর কেন দেওয়া হয়েছে?" এই বিষয়ে এভাবে চিন্তা করা—‘সমস্ত সাংসারিক দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে ঈশ্বরের প্রাপ্তিই মানব জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য’। বেদ ও ঋষি-রচিত গ্রন্থে বর্ণিত এই লক্ষ্যকে যোগাভ্যাসী তার মনে বারবার উচ্চারণ করবে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত পুরুষার্থের সহিত যোগাভ্যাস করবে।

লক্ষ্যের উপর বিচার করে, এই সিদ্ধান্ত নিন যে এই আসনে আমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারের জন্য বসেছি। এখন এক ঘণ্টা ধরে আমি শুধুমাত্র ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা করব, অন্য কোনো সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা করব না।

যোগাভ্যাসী সাধকের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি যে উপাসনার সময় সে তার সমস্ত সাংসারিক সম্পর্ক ভুলে যাবে, যেগুলো শরীরের কারণে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ এই সময় স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, পুত্র-পুত্রী এবং বন্ধু-সম্পর্কিত সমস্ত প্রাণীর এবং ভূমি-ভবন, ধন-সম্পদসহ সমস্ত জড় বস্তুর স্মরণও করবে না।

এর অতিরিক্ত অপর কার্য এটিও অত্যন্ত প্রয়োজন যে, ‘শরীরকে আত্মা মনে করার’ ভুল ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া। যেমন নিজেকে ‘আমি পুরুষ’, ‘আমি নারী’, ‘আমি তরুণ’, ‘আমি বৃদ্ধ’, ‘আমি কালো’, ‘আমি সাদা’, ‘আমি দুর্বল’, ‘আমি শক্তিশালী’, ‘আমি সুন্দর’, ‘আমি কুৎসিত’, ‘আমি লম্বা’, ‘আমি ছোট’ ইত্যাদি গুণাবলীর অধিকারী মনে করা। কারণ এগুলো সবই চিরস্থায়ী আত্মার গুণ নয়, বরং ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল, নষ্টশীল জড় শরীরের গুণাবলী।

সাংসারিক এবং শারীরিক সম্পর্কগুলো ভুলে সাধক তার প্রবৃত্তিকে অন্তর্মুখী করে তুলবে, কারণ এভাবে না করলে সে আত্মা-পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করতে পারবে না।

এরপর যোগাভ্যাসী 'স্ব-স্বামীসম্বন্ধ'-কে বুঝে তা দূর করার চেষ্টা করবে, অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মনে ধারণ করবে যে আমার কাছে এই শরীর এবং শরীর সম্পর্কিত যত বিদ্যা, ধন, বল, সম্মান, যোগ্যতা এবং অন্যান্য গুণ রয়েছে, সবকিছুর আদিমূল হলো পরমেশ্বর, আমি নই। কারণ আমার মধ্যে এত জ্ঞান নেই এবং এত বল নেই যে আমি এই শরীরসহ সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তু তৈরি করতে বা রক্ষা করতে পারি। ঈশ্বর মহতী করুণা করে এই সমস্ত বস্তু আমাকে ভোগ এবং মুক্তির জন্য উপকরণ হিসেবে দিয়েছেন। আমি তো শুধুমাত্র এই সমস্ত উপকরণের ব্যবহারকারী, প্রকৃত স্বামী হলেন ঈশ্বর।

স্ব-স্বামীসম্বন্ধ-কে জ্ঞান সহকারে ধ্বংস করার পর যোগাভ্যাসী 'ব্যাপক-ব্যাপ্য' সম্পর্ক বুঝবে। এই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্য এবং ঈশ্বর ব্যাপক, অর্থাৎ এমন কোনো কণা নেই যেখানে ঈশ্বর বিদ্যমান থাকেন না। যেমন আগুনের চুল্লিতে লোহার গোলক রাখলে গোলকের ভিতর আগুন সর্বত্র ব্যাপক হয়, তেমনি ঈশ্বর বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে বিরাজমান। এই ব্যাপক-ব্যাপ্য সম্পর্কের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে নিজের নিকটতা আরও গভীরভাবে অনুভব করার জন্য এভাবেও ভাবা উচিত যে আমি ঈশ্বরের মধ্যে ডুবিয়ে আছি, ঈশ্বরের মধ্যেই বসি, ঈশ্বরের মধ্যেই খাই, ঈশ্বরের মধ্যেই পান করি। অনাদিকাল থেকে আমি ঈশ্বরের মধ্যেই বাস করছি এবং অনন্তকাল পর্যন্ত ঈশ্বরের মধ্যেই বাস করব। আমি ঈশ্বর থেকে কখনোই আলাদা হতে পারব না।

ব্যাপক-ব্যাপ্য সম্পর্কের অবস্থা গড়ে তোলার পর যোগাভ্যাসী 'মন ও ইন্দ্রিয়ের জড়ত্ব' বুঝতে চেষ্টা করবে। এই বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত নেবে—"আমার মন একটি যন্ত্রের মতো জড় বস্তু, এটি নিজের থেকে কোনো বিষয় চিন্তা করে না। আমি, চেতন জীবাত্মা, যখন কোনো বাহ্যিক বা অন্তর্মুখী বিষয় জানার ইচ্ছা প্রকাশ করে মনকে প্রেরণা দিই, তখনই মন আমাকে সেই বিষয়ের জ্ঞান দেয়। যেমন ফটোগ্রাফারের ইচ্ছা ছাড়া ক্যামেরায় নিজে থেকে ছবি তুলে না, তেমনি আমার ইচ্ছা ও প্রেরণা ছাড়া মনও কোনো বস্তু সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দেয় না। তাই আমি এই জড় মনকে আত্মজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রণে রেখে এক ঘণ্টা পর্যন্ত ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তন করব না।"

উপরোক্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর এখন যোগাভ্যাসী ঈশ্বরের দ্রুত এবং সহজ অনুভূতির জন্য 'ঈশ্বর প্রণিধান' অবস্থার সাধন করবে। "সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, ন্যায়পরায়ণ, নিরাকার ঈশ্বর আমার আত্মার মধ্যে অবস্থান করছেন। তিনি আমার প্রতিটি শারীরিক, বাচনিক এবং মানসিক কর্মকে প্রতিক্ষণ দেখে, শোনে এবং জানেন। আমি কোনো কাজ তাঁকে গোপন করে করতে পারি না।"

যেমন দূরদর্শন সম্প্রচারকক্ষ (T.V. Telecasting Centre)-এ বসা ঘোষক (Announcer) জানে যে 'যদিও আমাকে দেখা যায় না, তবুও লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখ এবং কান আমাকে দেখছে ও শুনছে', এই ভাবনা নিয়ে সে কোনো অনুচিত কাজ করে না এবং অভদ্র কথা বলে না। তেমনি যোগাভ্যাসী তার মনে ভাববে যে 'ঈশ্বর আমার কাছে মা-বাবার মতো উপস্থিত আছেন এবং অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ, পবিত্র হৃদয়ে করা আমার স্তুতি-প্রার্থনা শুনছেন। আমার প্রার্থনা শুনে তিনি পরম করুণাময়, দয়ালু হয়ে অবশ্যই আমার মনোকামনা পূরণ করবেন, এতে একটুও সন্দেহ নেই।'

সাধককে সন্ধ্যোপাসনা করার আগে অবশ্যই এই রকম প্রস্তুতি নিতে হবে, যাতে সে উপাসনায় সফল হতে পারে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পরম আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করতে পারে।

উপাসনার স্থান

প্রায়ই দেখা যায়, শোনা যায় এমন কিছু বিশ্বাসও গড়ে ওঠে যে ঈশ্বরের পূজা, ভক্তি, ধ্যান, উপাসনা শুধুমাত্র মন্দিরে হয়, কোনো বিশেষ পাহাড়ে হয়, নদীর তীরে হয় বা জঙ্গলে হয়। এই স্থানগুলিতেই উপাসনা হতে পারে, সাধারণ স্থানে নয়—এমন বিশ্বাস সঠিক নয়। ঈশ্বরের উপাসনার জন্য স্থানের ততটা গুরুত্ব নেই, যতটা মনোযোগ, ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, রুচি ইত্যাদির গুরুত্ব রয়েছে। তবে অবশ্যই, স্থানটি শান্ত, একাকী, মনোরম, পরিষ্কার এবং কোলাহলমুক্ত হলে সেখানে বাধা কম হওয়ার কারণে ধ্যান ভালো হয়।

কিন্তু যদি মন নিয়ন্ত্রণে থাকে, ঈশ্বরের প্রতি রুচি ও প্রেম থাকে এবং প্রানায়ামের মাধ্যমে নিয়মিত মনকে থামিয়ে মন্ত্রের মাধ্যমে তার ধ্যান করা হয়, তাহলে ধ্যান যেকোনো জায়গায় করা যায়। বাড়ির বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বাড়ির মধ্যেই ধ্যান করা যায়, কোনো ঘরে ধ্যান করা যায়, বিছানায় ধ্যান করা যায়, চেয়ারেও ধ্যান করা যায়।

একইভাবে দিকের কথাও আসে যে কোন দিকে বসে ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত। দিকেরও কোনো বিশেষ প্রয়োজন নেই। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ যেকোনো দিকে ঈশ্বরের ধ্যান করা যায়। যেখানে থেকে শুদ্ধ বায়ু আসে, সূর্য উদয় বা অস্ত যায়, যেখানে জল, সাগর, নদী, পুকুর বা ঝর্ণা থাকে, এমন পরিবেশ মনকে আনন্দ দেয় এবং মনোযোগ বাড়ায়। কিন্তু এগুলোও গৌণ বিষয়। যদি ঈশ্বরের প্রতি ধ্যানের রুচি ও প্রেম থাকে, তাহলে দিকের কোনো গুরুত্ব নেই, কারণ ধ্যান চোখ বন্ধ করে করা হয় এবং চোখ বন্ধ করার পর আমরা কোথায় বসেছি বা কোন দিকে বসেছি তা ভুলে যাই, বরং ভুলে যাওয়াই উচিত। তাই দিক, স্থান ইত্যাদির ততটা গুরুত্ব নেই।

উপাসনার জন্য ভৌতিক সাধন এবং সামগ্রী

একইভাবে ঈশ্বরের উপাসনা সম্পর্কে একটি বিশ্বাসও গড়ে উঠেছে যে ঈশ্বরের প্রার্থনার জন্য ধূপ, দীপ, ফুল, আগরবাতি ইত্যাদি প্রয়োজন, আশেপাশে পানি থাকতে হবে, ফুলের বাগান থাকতে হবে, তবেই ঈশ্বরের ধ্যান সম্ভব। কিন্তু বাস্তবতা হলো ঈশ্বরের উপাসনার জন্য কোনো বাহ্যিক ভৌত বস্তু প্রয়োজন নেই। যেমন আমরা আজকাল দেখি ঈশ্বরভক্তরা ঈশ্বরের উপাসনার জন্য পাতা, ফুল, নৈবেদ্য, প্রসাদ, আগরবাতি, ধূপ, দীপক, মোমবাতি ইত্যাদি অনেক বস্তু অর্পণ করে থাকেন। এর কোনো প্রয়োজন নেই।

ঈশ্বরের কোনো বস্তুপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নেই। তিনি নিজেই প্রকাশস্বরূপ, তিনি আমাদের দাতা, আমরা তাঁকে কী দেব? এটি না বুঝার কারণে মানুষের মধ্যে এই ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে যে আমরা ঈশ্বরের কাছে কিছু নিয়ে যাবো, তবেই ঈশ্বর খুশি হবেন। ঈশ্বর পবিত্র, তাঁর সামনে আগরবাতি নিয়ে যাওয়ার কী দরকার? আগরবাতি থেকে দূষিত পরিবেশ দূর হয়। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে যেখানে আগরবাতি জ্বালানো হয়, সেখানে পরিবেশ কিছুটা শুদ্ধ হয়, সুগন্ধি হয়, যা মনের ওপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক নয়। একইভাবে দীপ জ্বালালে অন্ধকার দূর হয় এবং সেখানে আলো আসে, তবে এরও কোনো প্রয়োজন নেই। দেখা যায় এই আলো, আগরবাতি, ফুল ইত্যাদি বৃত্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধা দেয়, বরং বৃত্তি সৃষ্টি করে।

যদি আগরবাতির সুগন্ধ আসে, তাহলে আমাদের নাক সেটি গ্রহণ করবে এবং তার প্রতি মনোযোগ চলে যাবে। একইভাবে দীপক দেখলে আমাদের দৃষ্টি পরিবর্তিত হবে। চোখের মাধ্যমে ঈশ্বরের ধ্যান করতে বাধা সৃষ্টি হবে। ঈশ্বরের উপাসনার জন্য বলা হয়েছে "চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" অর্থাৎ মনের যে সমস্ত প্রবৃত্তি আছে যেমন চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শোনা, নাক দিয়ে গন্ধ নেওয়া, মুখ দিয়ে খাওয়া, ত্বকের মাধ্যমে স্পর্শ করা—উপাসনার সময় এই ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে যখন বিষয় গ্রহণ করা হয়, তখন এগুলো বাধা সৃষ্টি করে, তাই এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অতএব, উপাসনার সময় ভৌত বস্তু এবং ভৌত বস্তুদের গুণাবলীর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য যারা কিছু ফুল, ফল, উপহার, পূজার সামগ্রী, আগরবাতি ইত্যাদি নিয়ে অর্পণ করেন, তা উপাসনার জন্য অপরিহার্য নয়।

উপাসনার আসন

একইভাবে ঈশ্বরের ধ্যানের জন্য আসনের ব্যাপারেও মানুষের মধ্যে নানা রকম ধারণা গড়ে উঠেছে। যেমন পদ্মাসন, সিদ্ধাসন বা বজ্রাসন বসতে হবে, তবেই ধ্যান হবে, অথবা

এইভাবে বসতে হবে তবেই ধ্যান হবে—কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক নয়। ঈশ্বরের উপাসনার জন্য শরীরের স্থিরতা জরুরি। শরীরের স্থিরতার জন্য আমরা যে কোনো আসন নিতে পারি যা আমাদের উপযোগী, সেটা হতে পারে সিদ্ধাসন, সুখাসন বা অন্য কোনো আসন। বরং দেখা গেছে, প্রাথমিক সাধকদের জন্য পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ইত্যাদি কঠিন হয়। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে বসতে পারেন না। তাই যে কোনো সহজ আসন, যেটাতে দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট ছাড়াই সোজা বসা যায়, সেটি ব্যবহার করা উচিত।

ভাল স্তরের ধ্যান, উচ্চ স্তরের ধ্যান সাধারণত মাটির ওপর আসন বিছিয়ে সোজা হয়ে বসার মাধ্যমে হয়। কিন্তু যদি কারো কোমরে ব্যথা থাকে, পায়ে ব্যথা থাকে, আসনে বসতে পারে না, চৌকড়ি বসতে পারে না, তাহলে সে ব্যক্তি মাটির ওপর বসার পরিবর্তে চেয়ারে বসেও ধ্যান করতে পারে, আরামদায়ক চেয়ারেও বসে ধ্যান করতে পারে। বরং যদি এত ব্যথা বা অসুবিধা হয় যে বসতেও না পারে, তাহলে বিছানায় শুয়ে থেকেও ধ্যান করতে পারে। ধ্যান করার মূল কাজ হলো মনের একাগ্রতা, আসন বসানো নয়। হ্যাঁ, মাটির ওপর সোজা বসে ধ্যান করলে অলসতা ও প্রমাদ কম হয়, ধ্যান সহজ হয়। আরামদায়ক চেয়ারে বসলে বা বিছানায় বসলে এই সমস্যা হতে পারে যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়তে পারে, অলসতা আসতে পারে। তাই যারা সক্ষম, সুস্থ, তারা মাটির ওপর আসন বিছিয়ে সোজা হয়ে বসে ধ্যান করবেন। যারা সম্পূর্ণ সুস্থ নয় বা কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে, তারা আরামদায়ক চেয়ারে বসে বা বিছানায় বসেও ধ্যান করতে পারেন। প্রধান কাজ হলো মনকে বাহ্যিক বিষয় থেকে বিরত রেখে ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ করা।

উপাসনার সময় নির্ধারণ

একইভাবে ধ্যানের সময় সম্পর্কে অনেকের মধ্যে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে যে ঈশ্বরের ধ্যান শুধুমাত্র সকালে হয়। এমনকি কিছু মানুষ মনে করে যে ব্রহ্মমুহূর্তেই ধ্যান হয়, অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে, যখন সূর্য ওঠে নি। তাদের কথা সত্য যে সূর্যোদয়ের আগে ব্রহ্মমুহূর্তে ধ্যানের স্তর শ্রেষ্ঠ হয়, কিন্তু এর মানে এই নয় যে কেউ সূর্যোদয়ের আগে ওঠার অভ্যাস বা সামর্থ্য না থাকলে বা সময় না পেলে দিনের বাকি সময়ে ধ্যান করা যাবে না।

আদর্শ এটি যে আমরা প্রাতঃ ব্রহ্মমুহূর্তে উঠে ঈশ্বরের ধ্যান করব, কিন্তু যদি কোনো বাধা আসে, কোনো অসুবিধা হয়, কোনো অক্ষমতা থাকে, কোনো অভাব থাকে বা কোনো কষ্ট থাকে, তাহলে সূর্যোদয়ের পরেও ধ্যান করা যায়। ছয়টা বাজার পরেও ধ্যান করা যায়, সাতটা বাজার পরেও ধ্যান করা যায়, আটটার মধ্যেও ধ্যান করা যায়। কেউ যদি বলে যে তাদের

আটটা পর্যন্ত সময় নেই, কারণ বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে হয়, পরিবারের লোকজনকে দোকানে পাঠাতে হয়, অফিসে যেতে হয়, ফ্যাক্টরিতে যেতে হয়, তাহলে যারা আটটা বা দশটা পর্যন্ত সময় বের করতে পারে না, তাদের জন্য দশটার পরেও ধ্যান করা অনুচিত নয়। এগারোটাও ধ্যান করা যায়, বারোটাও ধ্যান করা যায়। কেউ যদি বলে বারোটার মধ্যে সময় নেই, তাহলে দুপুরের খাবার করার পরেও ধ্যান করা যায়। দুইটায় ধ্যান করা যায় বা যখনই বিশ্রামের সময় বা অবকাশ পাওয়া যায় তখন ধ্যান করা যায়। যদি দিনে অবকাশ না পাওয়া যায়, তাহলে রাতেও ধ্যান করা যায়।

যে ব্যক্তি বলে আমার সকালে সময় হয় না, তাই আমি ধ্যান করি না, এটা তার অভাব হবে। সে যেকোনো সময় ধ্যান করতে পারে। ভালো হয় যদি কেউ সকালে এবং সন্ধ্যায় ধ্যান করে, কিন্তু যদি বাধা থাকে, তাহলে অন্য সময়েও ধ্যান করা যায়, রাতেও ধ্যান করা যায়, যেকোনো সময় ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত।

যখনই সময় পাওয়া যায়, প্রসন্নতা হয়, মনোযোগ থাকে, বাধা না থাকে, তখনই ধ্যান করা উচিত। যদি শ্রেষ্ঠ সময় না পাওয়া যায়, তাহলে দুপুরে বা রাতে ধ্যান করা উচিত। ধ্যান করা অবশ্যই উচিত।

বাঁধাসমূহের সমাধান

সময়ের নির্ধারণ সম্পর্কে কিছু মানুষের এমন ধারণা থাকে যে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যান না করলে কোনো লাভ হয় না। তারা বলেন আমাদের দৈনন্দিন জীবন অগোছালো, আমরা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করতে পারি না। কখনো কিছু হয়, কখনো কিছু বাধা আসে, কখনো কোথাও যেতে হয়, কখনো কোথাও আসতে হয়, কখনো কেউ আসে, কখনো রোগ হয়, কখনো বেদনা হয়, কখনো নানা ধরনের কাজ আসে এবং আমাদের ধ্যান থেমে যায়। এই বিষয়ে জানা দরকার যে কোথায় বাধা আসে না? সবারই বাধা আসে। ভালো কথা হলো সময় নির্ধারণ করা উচিত। ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত, ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত, ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত—যেকোনো সময়, যখন কোনো বাধা আসে তখন আমরা আমাদের নিয়মকে ব্যতিক্রম হিসেবে সাময়িকভাবে সামলে নিতে পারি।

ধ্যান সম্পর্কিত সময়ের নিয়ম বানানো উচিত, এটি উপকারী। নিয়ম থাকার ফলে সুবিধা হয়। সংস্কারও গড়ে ওঠে যে আমরা ৬টা থেকে ৭টার নিয়ম করেছি। ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে আমরা ধ্যান করব। কিন্তু যেদিন বাধা আসে, সেদিন আমরা সাময়িকভাবে সময় পরিবর্তন করতে পারি। অতিথি এসেছে, কোনো বিশেষ কাজ হয়েছে, কোনো ঘটনা ঘটেছে, আমরা ৬টা

থেকে ৭টার মধ্যে ধ্যান করতে পারিনি, তাহলে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে করতে পারি, ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে করতে পারি। তারপর যখন বাধা না থাকে, তখন আবার নিয়মিত সময়ে ধ্যান করব। সময় নির্ধারণ থাকা উচিত, কিন্তু বাধার কারণে ধ্যান একদমই বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়, এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

উপাসনার পূর্বে স্নান, ব্যায়াম, শুদ্ধি আদি

মানুষের মধ্যে একটি ধারণাও থাকে যে শাস্ত্রে বিধান আছে যে ঈশ্বরের ধ্যান স্নান করে করতে হবে। কিন্তু সকালের তাড়াতাড়ি আমরা স্নান করতে পারি না, শরীরে কিছু অসুবিধা থাকে, সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে পারি না, রোগ থাকে, তাই স্নান না করলে ঈশ্বরের উপাসনা কীভাবে করব? তাদের কথাও ঠিক যে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে, ঘোরাঘুরি করে, শৌচ থেকে মুক্ত হয়ে, স্নান করে, ব্যায়াম করে বসা উচিত। কিন্তু কেউ যদি তাড়াতাড়ি উঠতে না পারে, ব্যায়াম করতে না পারে, স্নান করতে না পারে বা শৌচ থেকে মুক্ত হতে না পারে, তাহলে এর মানে এই নয় যে সে ধ্যান করতে পারবে না। ধ্যান অবশ্যই করতে হবে।

ভালো হয় স্নান করে ধ্যান করা, ব্যায়াম করে ধ্যান করা, কিন্তু যদি কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে এসব করা সম্ভব না হয়, যেমন অসুস্থতা, শরীরের দুর্বলতা, ক্লান্তি, তাহলে স্নান না করেও, ব্যায়াম না করেও, ঘোরাঘুরি না করেও, শৌচ না করেও মানুষ বসে ঈশ্বরের ধ্যান করতে পারে। ঈশ্বরের ধ্যানের জন্য এই নিয়ম বাধ্যতামূলক নয় যে শৌচ সেরে তারপরই ধ্যান হবে, স্নান না করলে বা ব্যায়াম না করলে ধ্যান হবে না, তাড়াতাড়ি না উঠলে ধ্যান হবে না, ঘোরাঘুরি না করলে ধ্যান হবে না। এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যে ধ্যান করা উচিত।

যখন আনন্দ হয় তখন দেখা যায় আমরা স্নান না করেও অনেক কাজ করতে পারি, যেমন কথা বলা, পড়া, খাওয়া, যজ্ঞ করা। যখন এই সব দৈনন্দিন কাজ স্নান না করেও করা যায়, ঘোরাঘুরি না করেও করা যায়, শৌচ না করেও করা যায়, তাহলে স্নান না করেও ধ্যান কেন করা যাবে না? হ্যাঁ, এতটুকু অবশ্যই যে ধ্যান ভালো স্তরের হবে না, ধ্যানের একাগ্রতা অনেক বেশি হবে না। কিছুটা হলেও ভালো। না করার থেকে ভালো। তাই ব্যায়াম না করেও, স্নান না করেও, ঘোরাঘুরি না করেও এবং প্রাথমিক প্রস্তুতি ছাড়াই মানুষ ঈশ্বরের ধ্যান করতে পারে এবং করা উচিত।

উপাসনার জন্য বস্ত্র পরিধান

একটি বিষয় অনেকবার সামনে আসে যে ঈশ্বরের ধ্যান বা উপাসনার জন্য বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরা হয় বা পরা উচিত। সেই বিশেষ বস্ত্রেই ধ্যান করা উচিত। লাল বস্ত্র, হলুদ বস্ত্র, সাদা বস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের বস্ত্র ছাড়া ধ্যান সম্ভব নয়। কিন্তু এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে আমরা বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরব, তবেই ধ্যান হবে। শুধু এটুকু অবশ্যই যে বস্ত্র যাই হোক না কেন, তা পরিষ্কার, পবিত্র এবং কম পরিমাণে হওয়া উচিত। কারণ অনেক বেশি বস্ত্র পরে বসলে ঘুম বা অলসতার প্রভাব পড়ে। খুব কম বস্ত্র পরলে ঠাণ্ডা, গরম বা বাতাসের প্রভাব পড়ে।

তাই, নিজের সুবিধা অনুযায়ী বস্ত্র পরেই ধ্যান করা যায়। হ্যাঁ, কিছু ব্যক্তিরা ধ্যানের বিষয়ে তাদের ব্যক্তিগত নিয়ম তৈরি করে রেখেছেন। তারা তাদের সুবিধা, মনকে সেই রকম অবস্থায় আনার জন্য, পরিবেশ তৈরি করার জন্য আলাদা বস্ত্র ব্যবহার করেন। যখন তারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তখন সেই বস্ত্র পরেন। সেই বস্ত্র পরে তারা খাবার খান না, বাইরে যান না, অন্য কোনো কাজ করেন না। তারা শুধু ঈশ্বরের উপাসনার সময়ই সেই বস্ত্র পরেন। ব্যক্তিগতভাবে ধ্যান করার সময় এর কিছু প্রভাব পড়ে। কিন্তু যখন আমরা ধ্যান করব, তখন আমাদের মনে থাকবে না আমরা কী ধরনের বস্ত্র পরেছি। কারণ বস্ত্র থেকে উপরে উঠে আমাদের ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে, ঈশ্বরের চিন্তা করতে হবে। তাই বিভিন্ন রঙ, আকৃতির বস্ত্র পরার কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই।

উপাসনা হেতু আচমন, অঙ্গস্পর্শ আদি ক্রিয়া

ঋষিরা উপাসনা করা ব্যক্তিকে আচামন, অঙ্গস্পর্শ ইত্যাদি কিছু কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন যা ধ্যানের সময় সাধকের জন্য সহায়ক হয়। তাই ধ্যানের সময় আচমন করাও উচিত, অঙ্গস্পর্শ করাও উচিত ইত্যাদি। নতুন নতুন সাধকদের এই বিষয় শেখানো হয়, বলা হয়, তাই তারা মনে করে ঈশ্বরের উপাসনায় আচমন করা বাধ্যতামূলক, অঙ্গস্পর্শ বাধ্যতামূলক। জল নিতে হবে, জল পান করতে হবে। পাত্র নিতে হবে। কাজকর্মে ব্যক্তির বিশ্বাস কম থাকে, শ্রদ্ধা কম থাকে। ভাবেন কে জল নেবে? কে আচমন করবে? ঠান্ডার সময় ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, সর্দি হচ্ছে, কাশি হচ্ছে। পান করতে পারছি না, গলা খারাপ হয়ে যাবে। তাদের জন্য বলা উচিত যে আমাদের ঋষিরা যেসব নিয়ম তৈরি করেছেন, তার পেছনে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। এই আচার্য ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় যাতে আমরা কোনো কাজ করি, পবিত্র হয়ে করি। জলের স্বভাব

পবিত্র। তাই আমরা যখন ঈশ্বরের ধ্যান করি, তখন পবিত্র হয়ে করাই উচিত। এজন্য আচার্য করা হয়। আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

যদি একজন মানুষ আনন্দময়, সুস্থ এবং কোনো বাধা না থাকে, পবিত্র ও একাগ্র মনোভাব সম্পন্ন হয়, তাহলে আচমন করার কোনো প্রয়োজন নেই। একইভাবে অঙ্গস্পর্শের কথাও প্রযোজ্য। যদি আমাদের শরীরে অলসতা, অবহেলা বা উদাসীনতা না থাকে, তাহলে আচমন ও অঙ্গস্পর্শ করার প্রয়োজন নেই। এই কাজগুলো মূলত অলসতা ও অবহেলা থাকলে করা উচিত। পানি পান করা উচিত এবং অঙ্গস্পর্শ করা উচিত। কিন্তু যদি সাধক সম্পূর্ণ সুস্থ, একাগ্রচিত্ত এবং পূর্ণ শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান করতে সক্ষম হয়, তাহলে এগুলো করার দরকার নেই। কিছু মানুষ মনে করে যে আমাদের অবশ্যই আচমন করতে হবে, এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, ঠান্ডার সময় ঠান্ডা লাগবে, গলায় সমস্যা হবে। তাই তারা ভয়ে ঈশ্বরের ধ্যানও করে না। তাই এই নিয়মটিকেও এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত নয় যে বাধ্যতামূলকভাবে এটি করতে হবে, তবেই উপাসনা হবে, না হলে উপাসনা হবে না।

নিশ্চিত মন্ত্র

একটি সন্দেহ প্রায়ই মানুষের মনে আসে যে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী পঞ্চমহাযজ্ঞ বিধিতে,, সংস্কারবিধিতে যেসব মন্ত্র উল্লেখ করেছেন, শুধুমাত্র সেগুলোর মাধ্যমে ঈশ্বরের ধ্যান সম্ভব, অন্য কোনো মন্ত্রের মাধ্যমে ধ্যান সম্ভব নয়। এটা কি সত্য? এ বিষয়ে উত্তর হলো, এমন নয় যে শুধুমাত্র ওই মন্ত্রগুলোর মাধ্যমে ঈশ্বরের ধ্যান সম্ভব। আমরা বেদের অন্য কোনো মন্ত্র থেকেও ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান করতে পারি। শুধু এটুকু শর্ত যে ঐ মন্ত্রগুলোর মধ্যে ঈশ্বরের গুণ, কর্ম ও স্বভাবের বর্ণনা থাকতে হবে। ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনার বিষয় থাকতে হবে। শুধু বেদমন্ত্র নয়, ঋষিদের রচিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, উপনিষদে থাকা শ্লোকের মাধ্যমে ও ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়। দর্শনশাস্ত্রে ঋষিরা যেসব সূত্র রচনা করেছেন, সেগুলোর মাধ্যমেও উপাসনা করা সম্ভব। ঋষিরা যেসব বাক্য রচনা করেছেন যেগুলোতে ঈশ্বরের গুণ, কর্ম ও স্বভাবের ব্যাখ্যা আছে, যেগুলো বেদমন্ত্রের ভাষ্য বা সূত্রের ভাষ্য হিসেবে আছে, সেগুলো দ্বারাও ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়।

অর্থাৎ, আমরা যেকোনো সাধারণ শব্দ দিয়েও ঈশ্বরের প্রার্থনা ও উপাসনা করতে পারি, শর্ত হলো মন্ত্র, শ্লোক, বাক্য বা শব্দে ঈশ্বরের গুণ, কর্ম ও স্বভাবের বর্ণনা থাকতে হবে। কোনো মন্ত্র, বাক্য, সূত্র বা শ্লোক যদি বলে ঈশ্বর কেমন, কী ধরনের গুণাবলী আছে, কী ধরনের কর্ম করে, কী ধরনের স্বভাবের অধিকারী, ইত্যাদি, তাহলে সেই মন্ত্র, সূত্র, শ্লোক বা বাক্য দ্বারা আমরা ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা করতে পারি।

যে ব্যক্তি মন্ত্র জানে না, শ্লোক জানে না, সূত্র জানে না, সংস্কৃত জানে না, ঋষিদের বাক্যও জানে না, তার কাছে কোনো ভালো সংস্কৃত শব্দ নেই, তার জন্যও উপায় আছে। তিনি বিদ্বান ও ভক্তদের রচিত যে ভজন, গান রয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে ঈশ্বরের ধ্যান করতে পারেন। ধ্যানের জন্য একাগ্রতা ও আত্মসমর্পণ প্রয়োজন। যদি আমাদের আত্মসমর্পণ ঈশ্বরের প্রতি হয় এবং আমরা একাগ্রচিত্ত, তাঁর প্রতি প্রেম করি, তাহলে ঈশ্বরের ধ্যান ভজন বা গানের মাধ্যমে করাও সম্ভব।

উপাসনা হেতু মন্ত্র চয়ন

যে মন্ত্রগুলি ঋষিরা ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনার জন্য নির্বাচন করেছেন, সেই মন্ত্রগুলিতে ঈশ্বরের উপাসনা কিভাবে করতে হয়? কী কী চাওয়া উচিত? আমাদের কী কী প্রত্যাশা আছে? ঈশ্বর থেকে আমরা কী আশা করতে পারি? এসব বিষয় মন্ত্রগুলিতে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। শরীর সম্পর্কে, মন সম্পর্কে, আত্মা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশাগুলো কী? আমাদের কী প্রয়োজন? ঈশ্বর কী দিতে পারেন? এসব বিষয় মন্ত্রগুলিতে সূত্র আকারে বলা হয়েছে।

ঈশ্বর কেমন? তাঁর গুণ, কর্ম, স্বভাব কেমন? আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি? ঈশ্বরের উপাসনা থেকে কী লাভ হয়? এর গুরুত্ব ও উপকারিতা কী? ঈশ্বরের উপাসনা থেকে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয় কি? এসব বিষয় যত সূক্ষ্মতা, সরলতা ও সংক্ষিপ্ততায় মন্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে, অন্য কোনো মন্ত্রে তেমন পাওয়া যায় না।

এইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে সে ওই মন্ত্রগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা করবে। কারণ ঋষিরা বুদ্ধিমান ছিলেন, তারা বিশেষ মন্ত্র নির্বাচন করেছেন, সাধারণ কোনো মন্ত্র গ্রহণ করেননি। তবে দেখা যায়, একই ধরনের মন্ত্র বার বার উচ্চারণ করলে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যেমন একই ধরনের খাবার খেলে বা একই ধরনের পোশাক পরে ক্লান্ত লাগে, তেমনি একই ধরনের মন্ত্র উচ্চারণ করেও ক্লান্তি আসে। এজন্য সুযোগ আছে যে আমরা আরও বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র গ্রহণ করতে পারি, যেগুলোতে ঈশ্বরের গুণ, কর্ম ও স্বভাব ভালোভাবে বর্ণিত আছে এবং যেগুলোতে উপাসনার লাভ ও গুরুত্বও বলা হয়েছে। ঐ মন্ত্রগুলির মাধ্যমে ও ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা করা যায়। কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই যে শুধুমাত্র সংস্কার বিধি বা পঞ্চমহাযজ্ঞ গ্রন্থে বর্ণিত মন্ত্র থেকেই ঈশ্বরের ধ্যান হতে পারে, অন্য মন্ত্র, সূত্র, শ্লোক, বাক্য বা শব্দ থেকে ধ্যান হবে না।

উপাসনায় সফলতার হেতু ঈশ্বর-সমর্পণ

ঈশ্বরে বিশেষ ভক্তি বলতে বোঝায় ঈশ্বরকে ছাড়া অন্য কাউকে বেশি প্রিয় না করা, ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী আচরণ করা, প্রতিটি কাজ ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা এবং তার পার্থিব ফল (যেমন ধন, সম্মান ইত্যাদি) কামনা না করা—এইটিই 'ঈশ্বর-সমর্পণ' নামে পরিচিত। ঈশ্বরকে নিজের অন্তর ও বাহিরে উপস্থিত মনে করে এবং 'ঈশ্বর আমাকে দেখছেন, শুনছেন, জানছেন' এই বিশ্বাস নিয়ে সমস্ত আচরণ করা ব্যক্তির সমাধি দ্রুত স্থির হয়।

ঈশ্বর সমর্পণের বিধি

যে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করতে হবে, তাঁর স্বরূপ (গুণ, কর্ম, স্বভাব) ভালোভাবে বোঝা উচিত, যাতে ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি বা সন্দেহ না থাকে। বেদ, দর্শন এবং উপনিষদ ইত্যাদি বৈদিক গ্রন্থের স্বাধ্যায়-শ্রবণ এতে অনেক সহায়ক হয়।

"আমার কাছে যে শরীর, ধন, বল, বিদ্যা ইত্যাদি উপকরণ বিদ্যমান আছে, এই সবের স্রষ্টা, পালনকারী, রক্ষক-স্বামী ঈশ্বর, আমি নই, আমি শুধু এই সবের ব্যবহারকারী মাত্র।" এই বিষয়ে চিন্তা করে নিশ্চিত হওয়া উচিত।

"ঈশ্বর প্রদত্ত এই শরীর, ধন ইত্যাদি সমস্ত উপকরণের ব্যবহার আমি ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুযায়ী (বেদ এবং ঋষিকৃত গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী) করব, নিজের ইচ্ছায় নয়" এমন সংকল্পও করা উচিত।

শরীর, বুদ্ধি, বল, ধনাদি সমস্ত উপকরণের ব্যবহার ঈশ্বরের প্রাপ্তির জন্যই করা উচিত, পার্থিব উদ্দেশ্য—ধন, মান, প্রতিষ্টা, খ্যাতি ইত্যাদির জন্য নয়।

শরীর, বাণী এবং মন দিয়ে কাজ করার সময় মনে এই ভাবনা রাখতে হবে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী হওয়ার কারণে আমার প্রতিটি কর্মকে জানেন। আমি কখনোই, কোথাও, কোনো কাজ তাঁর নিকট লুকাতে পারব না, যেহেতু ঈশ্বর জানেন, তাহলে কেন আমি আমার কর্মগুলো তাঁর সামনে রেখে করব না? এই চিন্তা করে সাধক নিজেকে এবং নিজের সমস্ত কর্মকে ঈশ্বরকে নিবেদিত করে দেবে।

ঈশ্বর সমর্পণকারী যোগাভ্যাসীকে মন থেকে এমন ভাবনাও গড়ে তুলতে হবে যে, "আমি ঈশ্বরের মধ্যে ডুবে আছি এবং আমার মধ্যেও ঈশ্বর আছে—অর্থাৎ আমি তাঁর মধ্যে আছি এবং তিনি আমার মধ্যে আছেন।"

ঈশ্বর সমর্পণকারী সাধককে নিজের মনকে অন্তর্মুখী রাখতে হবে, অর্থাৎ মন ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে প্রয়োজন অনুযায়ীই পার্থিব আচরণ করতে হবে।

ঈশ্বর সমর্পণকারী সাধককে তার আচরণ রাগ-দ্বেষের মতো দোষ থেকে মুক্ত রেখে নিঃস্বার্থ ভাবনায় করতে হবে। কোনো কাজ সফল না হলে বা বাধা এলে মনকে শান্ত, প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মনকে কোনো ধরনের ক্রোধ, অস্থিরতা, শোক, চিন্তা ইত্যাদিতে পড়তে দেওয়া যাবে না। এর জন্য তাকে কঠোর তপস্যা করতে হবে।

বারবার চিন্তা করে যোগাভ্যাসীকে নিশ্চিত করতে হবে, "সংসারের সমস্ত উৎপন্ন বস্তু অনিত্য এবং এই বস্তু থেকে প্রাপ্ত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখমিশ্রিত।" এভাবে নিশ্চিত হওয়ার ফলে তার মনে এই বস্তুগুলোর প্রতি তৃষ্ণা নষ্ট হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, শ্রদ্ধা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এমন অবস্থায় ব্যক্তি ঈশ্বর সমর্পণ ভালোভাবে করতে পারে। কারণ বৈরাগ্য ছাড়া ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হয় না এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ছাড়া ঈশ্বর প্রণিধান হয় না। শুরুতে নতুন সাধককে শান্ত একান্ত স্থানে আসন নিয়ে চোখ বন্ধ করে ঈশ্বর সমর্পণের অভ্যাস করা উচিত। অভ্যাস হলে সে চোখ খোলা রেখে এবং ভিড়বহুল স্থানে থেকেও ঈশ্বর সমর্পণ করতে সক্ষম হয়।

সাধককে সারাদিন পার্থিব ক্রিয়া-ব্যবহার করলেও সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর সমর্পণের অবস্থান বজায় রাখতে হবে। এজন্য প্রথমে স্থূল কাজ যেমন—ঘোরাফেরা, ব্যায়াম, স্নান, আহার গ্রহণ, বাটি-বাসন-বাসা ধোয়া ইত্যাদি করতে করতে ঈশ্বর সমর্পণের অভ্যাস করা উচিত। কারণ এই কাজগুলো করতে তুলনামূলক কম একাগ্রতা লাগে।

যখন স্থূল কাজগুলোতে ঈশ্বর সমর্পণ ভালোভাবে বজায় রাখার অভ্যাস হয়ে যায়, তখন সূক্ষ্ম কাজ যেমন পড়া-শোনা, বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি করতে করতে ঈশ্বর সমর্পণের অভ্যাস করা উচিত।

কোনো কাজ করতে করতে যদি সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর সমর্পণ করা সম্ভব না হয়, তবে কাজ শুরু করার আগে মনেই মনেই ঈশ্বরের কথা ভেবে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো দিয়ে তাঁর অনুমতি নিতে হবে—

"হে পরমেশ্বর, আমি এই কাজটি শুরু করতে যাচ্ছি। এই কাজের সফলতার জন্য আমি আপনার সাহায্য চাই। আমাকে ক্ষমতা, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে রক্ষা করুন, যাতে আমি কোনো অশুভ চিন্তা না করি।"

কাজ শেষ হলে আবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে এই শব্দগুলোতে তাঁর ধন্যবাদ দিতে হবে— "হে প্রভু! আপনার করুণা ও সাহায্যে আমি এই কাজ সম্পন্ন করেছি, আমি আপনার ধন্যবাদ জানাই। আমি এই কাজের কোনো পার্থিব ফল (যেমন ধন, সম্মান ইত্যাদি) চাই না। এটি আমি শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ থেকে করেছি।”

উপরোক্ত নির্দেশের অনুসারে প্রয়াস করার পর যোগাভ্যাসীর ‘ঈশ্বর সমর্পণ’ বিষয়ে অবশ্যই সফলতা মিলবে।

(ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতির চিন্তন)

ঈশ্বরের চিন্তন

হে পরমেশ্বর, আপনি সত্য, অর্থাৎ এক সত্তামূলক পদার্থ। আপনি চিৎ, অর্থাৎ সচেতন, সবকিছু জানেন। আপনি আনন্দরূপ, আপনি কখনো দুঃখী হন না। আপনি নিরাকার, আপনার কোনো আকার, রং বা মূর্তি নেই। আপনি সর্বশক্তিমান, বিশ্ব সৃষ্টি, পালন, বিনাশ এবং জীবদের কর্মফল প্রদান করতে কারো সাহায্য নেন না। আপনি ন্যায়পরায়ণ, যেমন মানুষ (ভালো বা খারাপ) এবং যতটা কর্ম করে, তেমন এবং ততটাই ফল দেন।

হে প্রভু, আপনি করুণাময়, আপনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া করে তাদের সকল প্রকার সুখ-সাধন দিয়েছেন। আপনি অজন্মা, অর্থাৎ জীবদের মতো শরীরের সংযোগের জন্ম নেন না। আপনি অনন্ত, অর্থাৎ আপনার বিশালতার কোনো সীমা নেই। আপনি নির্বিকার, যেমন শাক-ফল ইত্যাদি জড় পদার্থে গলানো, পচানো, বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটে, তেমনি কোনো পরিবর্তন আপনার মধ্যে হয় না।

হে পরমেশ্বর, আপনি অনাদি, আপনার কোনো উৎপত্তি হয়নি। আপনি অনুপম, আপনার মতো জ্ঞান, বল ও আনন্দসম্পন্ন অন্য কোনো বস্তু নেই। হে প্রভু, আপনি সর্বাধার, আপনি ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ-গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থের আধার।

হে দেব, আপনি সর্বেশ্বর, এই বিশ্বে যত সম্পদ, জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য, বৃক্ষ-উদ্ভিদ, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি পদার্থ আছে, সেগুলোর আপনি একমাত্র স্বামী। আপনি সর্বব্যাপী, বিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু থেকে আত্মা পর্যন্ত এবং বৃহত্তম সূর্যাদির মধ্যে আপনি বিদ্যমান।

হে প্রভু, আপনি সর্বান্তর্যামী, আপনি সকলের মধ্যে অবস্থান করে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করেন। হে পরমেশ্বর, আপনি অজর, কখনো বৃদ্ধ বা দুর্বল হন না। আপনি অমর, কখনো মরে না। আপনি অভয়, আপনাকে কারো থেকে কোনো ভয় হয় না। আপনি নিত্য, সর্বদা ছিলেন এবং সর্বদা থাকবেন।

হে প্রভু, আপনি পবিত্র, অর্থাৎ আপনার মধ্যে অজ্ঞানতা নেই এবং আপনি কখনো পাপকর্ম করেন না। হে পরমেশ্বর, আপনি সৃষ্টিকর্তা, আপনি এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। হে করুণানিধান, এই বিশ্বে শুধুমাত্র আপনি উপাস্য, অন্য কোনো বস্তু উপাস্য নয়।

আপনি আমাদের প্রতি করুণা করুন, যাতে আমরা আপনার নিত্যকালীন উপাসনা করতে পারি এবং আপনার থেকে জ্ঞান, বল, আনন্দ, নির্ভয়তা লাভ করে আমাদের জীবন সফল করতে পারি।

জীবের চিন্তন

হে পরমেশ্বর! আমি সৎ-চিৎ-স্বরূপ আত্মা, শরীর নই। এই শরীর তো আমার নিবাস স্থান। আমি এই শরীরে, হৃদয়ে বাস করি। এই শরীর তো মরণধর্মী, কিন্তু আমি নিত্য, অজর, অমর। হে প্রভু! আমি জীব, না নারী, না পুরুষ, না নপুংসক। আপনি আমাকে যেই শরীরের সঙ্গে যুক্ত করেন, সেই শরীরধারী আমাকে বলা হয়। হে পরমাত্মা! আমার এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক অনিত্য এবং শরীরের মতোই মা, বাবা, ভাই, বোন ইত্যাদি সম্পর্কের সাথেও সম্পর্ক অনিত্য। এই শরীর ছেড়ে দিলে এই সংসারী সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। আদিসৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত আত্মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং ছিন্ন হয়েছে। অগণিত ব্যক্তির পিতা, মাতা, পুত্র-পুত্রী, ভাই-বোন হয়েছি আমি এবং অজস্রবার আমার কর্মফলের অনুসারে পশু-পাখির শরীর ধারণ করেছি। এসবের হিসাব রাখা অসম্ভব। হে প্রভু! আমি জীব অত্যন্ত অণুরূপ এবং একদেশী। আমার নিজস্ব জ্ঞানও খুব সামান্য। আপনি দ্বারা শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় প্রাপ্তির মাধ্যমে আমি আমার স্বরূপ জানার এবং কর্ম করার সক্ষমতা পাই। হে পরমাত্মা! আপনি আমাকে বিভিন্ন উপায় দিয়েছেন কর্ম করার স্বাধীনতা। আমি ইচ্ছামতো ভাল-মন্দ কর্ম করতে বা না করতে স্বাধীন, কিন্তু সেই কর্মফল ভোগে আপনার ন্যায়বিচারের অধীন। আমার করা কর্মফল থেকে আমি পালাতে পারি না, কখনো না কখনো অবশ্যই ভোগ করতে হয়। এই কর্মফলের দায়ভার আমার উপরই, মন, বুদ্ধি, শরীরের নয়। হে দেব! যেমন আমি আত্মা, তেমনি সমগ্র বিশ্বের প্রাণীগুলোও আত্মা। স্বরূপে সমস্ত আত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যে পার্থক্য দেখা যায়, তা শরীর, বুদ্ধি, জ্ঞান, বল, কর্ম ইত্যাদির কারণে। হে পরমেশ্বর! যতক্ষণ আমার মধ্যে অজ্ঞানতা (রাগ-দ্বেষ-মোহ) আছে, ততক্ষণ আমি জন্ম-মরণের চক্র থেকে মুক্তি পাব না। হে প্রভু! এখন আমি আপনাকে প্রাপ্ত হতে চাই, কারণ আমি পড়েছি, শুনেছি যে জীব আপনার অনুভূতি-সাক্ষাৎ লাভ করলে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পায় এবং আপনার পরম আনন্দের অংশীদার হয়। অতএব হে প্রভু! এখন আমাকে জ্ঞান, বল, আনন্দ দয়া করে দান করুন এবং আমি কৃতজ্ঞ হব। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনার উপাসনা করতে বসেছি। আপনি দয়ার ভাণ্ডার, আমার এই আশা দ্রুত সফল করবেন এই বিশ্বাস রাখি।

প্রকৃতির চিন্তন

হে পরমেশ্বর! এই যে বিশ্ব আমাদের প্রদর্শিত হচ্ছে, এটি আপনাকে প্রাপ্তির উপায়। এই বিশ্বের মূল কারণ 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমাণুর নাম। এই পরমাণুগুলো তিন

প্রকারের—‘সত্ত্বগুণ’, ‘রজোগুণ’ এবং ‘তামোগুণ’। এই তিন ধরনের পরমাণু জড়, এদের মধ্যে জ্ঞান নেই। এই পরমাণুগুলো অনাদি এবং অনন্ত, অর্থাৎ কখনো সৃষ্টি হয়নি এবং কখনো ধ্বংস হবে না। হে প্রভু! আপনি এই সূক্ষ্ম পরমাণুগুলোকে নিয়ে আপনার অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান দ্বারা এই দৃশ্যমান সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন। সর্বপ্রথম এই পরমাণুগুলোকে মিলিয়ে মহত্তত্ব নামক পদার্থ সৃষ্টি করেন, যার সাহায্যে আমরা বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি। এরপর মহত্তত্ব থেকে ‘অহংকার’ নামক পদার্থ সৃষ্টি করেন, যার মাধ্যমে জীবআত্মা নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি করে। হে পরমেশ্বর! আপনি অহংকার থেকে ষোলটি পদার্থ সৃষ্টি করেন, যা নিম্নরূপ—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় (গন্ধ, চক্ষু, শ্রবণ, ত্বক ও জিহ্বা), পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, বাক, গুদা, উপস্থ), পাঁচ তন্মাত্রা (সূক্ষ্ম ভৌত) যা হলো গন্ধ তন্মাত্রা, রূপ তন্মাত্রা, শব্দ তন্মাত্রা, স্পর্শ তন্মাত্রা এবং রস তন্মাত্রা। ষোলতম হলো মন, যার মাধ্যমে আমরা সংকল্প-বিকল্পসহ বিভিন্ন কাজ করি। হে ভগবান! এরপর এই পাঁচ তন্মাত্রা থেকে আপনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ—এই পাঁচ স্থূল ভৌত সৃষ্টি করেন। এই পাঁচ স্থূল ভৌতের সংযোগে আপনি মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীর শরীর তৈরি করেন এবং একই ভৌত থেকে সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ সৃষ্টি করেন। ৪ বিলিয়ন ৩২ কোটি বছর এই বিশ্ব থাকে এবং ৪ বিলিয়ন ৩২ কোটি বছর এই বিশ্ব তার কারণরূপ (প্রকৃতি) তে থাকে, যাকে প্রলয় অবস্থা বলা হয়। হে করুণাময় দেব! আপনি এই বিশ্ব দুটি উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি করেছেন—একটি ভোগের জন্য, অন্যটি আপবর্গের জন্য। হে প্রভু! সশরীরে এই সংসারে থাকাকালীন আমরা জীব কখনো পূর্ণ ও স্থায়ী সুখ লাভ করতে পারি না। বিশ্বের সমস্ত পদার্থে যে সুখ লাভ করে, তাকে অবশ্যই পরিণাম, তাপ ইত্যাদি চার ধরনের দুঃখ ভোগ করতে হয়। হে প্রভু! অজস্র বছর ধরে আমি এই কঠিন সংসারে নানা যোনিতে জন্ম নিয়ে জন্ম-মরণসহ দুঃখ ভোগ করে আসছি। এখন আমি আপনার কাছে বিনীত প্রার্থনা করছি, আমাকে জ্ঞান, বল ও সামর্থ্য দান করুন, যাতে আমি মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারি এবং আপনার অমৃতময় কোলে বসে পূর্ণ ও স্থায়ী সুখ লাভ করতে পারি।

ধ্যান হেতু ঈশ্বরের জপের বিধি

১. কোনো মন্ত্র, বাক্য বা শব্দ বারংবার উচ্চারণ করাকে ‘জপ’ বলা হয়।

২. যে মন্ত্র, বাক্য বা শব্দ দিয়ে জপ করা হয়, তা ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা বা উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া উচিত, অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে নয়।

৩. জপের সময় তিনটি কাজ করতে হয়—

(ক) শব্দের উচ্চারণ,

(খ) শব্দের অর্থের বিচার (যাকে ভাবনা বলা হয়),

(গ) ঈশ্বর প্রণিধান।

উপরোক্ত তিনটি কাজ ছাড়া জপের পূর্ণ ফল লাভ হয় না।

৪. যদি জপের সময় তিনটি কাজ একসঙ্গে করা সম্ভব না হয়, তবে প্রথমে শব্দ/মন্ত্রের উচ্চারণ করা উচিত। তারপর বিরতি নিয়ে শব্দ/মন্ত্রের অর্থের ভাবনা করা উচিত। কিন্তু ঈশ্বর প্রণিধান তো অবশ্যই উভয় কাজের সময় সঙ্গী থাকা উচিত। নিয়মিত অনুশীলনে এই তিন কাজ একসঙ্গে করতে সক্ষম হওয়া যায়।

৫. জপ প্রধানত তিন ধরনের হয়—

(ক) উচ্চস্বরে বলে,

(খ) শব্দ না করে, শুধু ঠোঁট নাড়িয়ে,

(গ) মনে উচ্চারণ করে [ঠোঁট না নাড়িয়ে]।

৬. নতুন সাধকের জন্য উচ্চস্বরে জপ করা সহজ হয়। এভাবে করলে সে মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। সাধকের যোগ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদ্ধতিও উপযুক্ত মনে হতে শুরু করে।

৭. এক সময়ে (এক উপাসনার সময়) শুধুমাত্র একটি মন্ত্র বা শব্দ বারংবার উচ্চারণ করে জপ করা উচিত। যেমন—

"ওতম্ ন্যায়কারী, ওতম্ ন্যায়কারী, ওতম্ ন্যায়কারী।"

এভাবে করলে ঈশ্বরের স্বরূপ আমাদের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। বিপরীতে দ্রুত শব্দ পরিবর্তন করলে বিশেষ প্রভাব পড়ে না, যেমন—

"ওতম্ ন্যায়কারী, ওতম্ দয়ালু, ওতম্ অজন্মা" ইত্যাদি।

৮. যদিও ঈশ্বরের যেকোনো নামের জপ ধ্যানের সময় করা যায়, তবে যেসব মন্ত্র, শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের সর্বাধিক স্বরূপ (গুণ, কর্ম, স্বভাব) আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, সেসব শব্দ বা মন্ত্রের জপ বেশি ফলপ্রসূ হয়। বহু মন্ত্র ও শব্দের নির্বাচন ঋষিরা করেছেন, আমাদের সেগুলো দিয়েই জপ করা উচিত, যেমন—

(ক) ওতম্,

(খ) গায়ত্রী মন্ত্র,

(গ) প্রাণায়াম মন্ত্র = ওতম্ ভূঃ, ওতম্ ভুবঃ ইত্যাদি,

(ঘ) ওতম্ অসতো মা সদ্গময়...

এছাড়াও অন্যান্য শব্দ বা মন্ত্রের মাধ্যমে জপ করা যায়, যেমন—

(চ) ওতম্ আনন্দ,

(ছ) ওওম্ সত্যং, জ্ঞানং, অনন্তং, ব্রহ্ম,

(জ) ওওম্ তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি...,

(ঝ) ওওম্ বিশ্বানি দেব সবিতর্... ইত্যাদি।

৯. ঈশ্বরের যে গুণ, কর্ম, স্বভাবকে মনে রেখে জপ করা হয়, ঈশ্বরের সেই গুণেরই প্রাপ্তি হয়, যেমন—

(অ) 'আনন্দ' শব্দ দিয়ে জপ করলে আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

(আ) 'সর্বজ্ঞ' শব্দ দিয়ে জপ করলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

(ই) 'রক্ষক' শব্দ দিয়ে জপ করলে আমাদের মধ্যেও এবং অন্যদের রক্ষা করার গুণ আসে।

(ঈ) 'নির্ভয়' শব্দ দিয়ে জপ করলে নির্ভয়তা প্রাপ্ত হয়।

"ওওম" শব্দের জপ বিধি (ধ্বনিপূর্বক)

এর বিধি এই রকম যে সাধককে ভালোভাবে আসন নিয়ে (অর্থাৎ সোজা হয়ে) বসতে হবে এবং প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে শরীরে ভর্তি করতে হবে। যখন বায়ু শরীরে সম্পূর্ণভাবে ভরে যাবে, তখন 'ওওম্' শব্দটি গভীরভাবে, প্রেমপূর্ণভাবে উচ্চারণ করতে হবে। উচ্চারণ করার সময় ভিতরে ভরা বায়ু স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাইরে বেরিয়ে আসবে। যখন 'ওওম্' শব্দের উচ্চারণ শেষ হবে, তখন কিছুক্ষণ থেমে সেই শব্দের একটি অর্থ (যেমন সর্বরক্ষক) সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। এই চিন্তা এইভাবে করা যেতে পারে, "হে পরমেশ্বর! আপনি সর্বরক্ষক, আপনি আমার রক্ষা করুন।" এতটুকু চিন্তা করে আবার শরীরে শ্বাস নিয়ে আগের মতো ধীরে ধীরে গভীর ও প্রেমপূর্ণভাবে 'ওওম্' শব্দের উচ্চারণ করতে হবে। যখন উচ্চারণ শেষ হবে, তখন আবার একইভাবে তার অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। এইভাবে বারবার উপাসনার সময় 'ওওম্' শব্দের দীর্ঘ স্বরে উচ্চারণ এবং সেই শব্দের কোনো একটি অর্থের চিন্তা করতে হবে। এই দুই কাজের সঙ্গে একটি তৃতীয় কাজ, অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধানও করতে হবে। "ঈশ্বর আমাকে দেখছেন, শুনছেন, জানেন, আমি তাঁর মধ্যে মগ্ন, ঈশ্বর আমার ভিতরে বিদ্যমান" এমন চিন্তা (ভাবনা) করা ঈশ্বরপ্রণিধান নামে পরিচিত। শব্দের উচ্চারণ, শব্দের অর্থের চিন্তা এবং ঈশ্বরপ্রণিধান বজায় রাখার মাধ্যমে জপের বিশেষ ফল লাভ হয়।

একইভাবে উচ্চারণ না করেও (শুধুমাত্র ঠোঁট নাড়িয়ে) এবং এমনকি ঠোঁট না নাড়িয়েও মনের মধ্যে শব্দের উচ্চারণ, অর্থের চিন্তা এবং ঈশ্বরপ্রণিধান করে জপ করা যায়।

গায়ত্রী মন্ত্রের জপ বিধি

প্রথম পদ্ধতি:

উপাসনার সময় আসনে বসে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে গভীর মনোযোগ দিয়ে 'গায়ত্রী মন্ত্র' উচ্চারণ করতে হবে। মন্ত্রটি সম্পূর্ণ উচ্চারণ করার পর মন্ত্রের প্রতিটি শব্দের অর্থ নিয়ে চিন্তা করতে হবে। প্রথম শব্দের অর্থ বুঝে তারপর দ্বিতীয় শব্দের অর্থ নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এইভাবে মন্ত্রের সব শব্দের অর্থ চিন্তা হয়ে গেলে আবার আগের মতো 'গায়ত্রী মন্ত্র' উচ্চারণ করতে হবে এবং একে একে প্রতিটি শব্দের অর্থ চিন্তা করতে হবে।

'গায়ত্রী মন্ত্র' জপ অর্থ-চিন্তা সহকারে করতে হবে। যদিও এক মন্ত্রের উপর এই পদ্ধতিতে ৫-৭ মিনিটও লাগতে পারে। মন্ত্রের উচ্চারণ এবং মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করার সময় 'ঈশ্বর প্রণিধান' বজায় রাখতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি:

যখন সাধক গায়ত্রী মন্ত্রের সমস্ত শব্দের অর্থ স্মরণ করতে সক্ষম হবে, তখন গায়ত্রী মন্ত্রটি একসাথে সম্পূর্ণ উচ্চারণ না করে দীর্ঘ স্বরে ধীরে ধীরে এক এক শব্দ উচ্চারণ করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দের অর্থও চিন্তা করতে হবে। যেমন, 'ওওম্' শব্দ উচ্চারণ করার সময় এই শব্দের অর্থ "হে ঈশ্বর, আপনি সর্বরক্ষক..." ইত্যাদি মনের মধ্যে ভাবতে হবে। এরপর 'ভূঃ' শব্দ উচ্চারণ করার সময় "আপনি আমার প্রাণাধার..." ইত্যাদি অর্থ চিন্তা করতে হবে। এভাবেই পুরো মন্ত্রটি দীর্ঘ স্বরে উচ্চারণ করে অর্থ চিন্তা করতে হবে। এই দুই কাজের সময় 'ঈশ্বর প্রণিধান' বজায় রাখার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

ধ্যানের সময় আলস্যের কারণ

ধ্যানের সময় ঘুম বা অলসতা থামানো জরুরি হয়। অনেক সাধকের তো এমন হয় যে তারা বুঝতেই পারে না যে তারা ধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। অনেকেই বুঝতে পারেন, কিন্তু উপাসনার সময় কেন ঘুম বা অলসতা আসে, তার কারণগুলো সঠিকভাবে জানেন না। ঘুম এবং অলসতা আসার কিছু কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো। রাতে ঘুম পুরোপুরি না হওয়া বা ভালো না হওয়া। পেট পরিষ্কার না হওয়া (মলত্যাগ ঠিকমতো না হওয়া)। শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম অতিরিক্ত পরিমাণে করা। খাওয়াদাওয়া অনুকূল না হওয়া, ভারী ও অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া। তামসিক বা নেশাজাতীয় বস্তু (তামাক, গাঁজা ইত্যাদি) ব্যবহার করা। শরীরে জ্বর বা অন্যান্য রোগ থাকা। শরীরে দুর্বলতা থাকা। আসন সঠিকভাবে না নেওয়া (কোমর সোজা না

করে বসা)। উপাসনার আগে স্নান না করা। যথাযথ পরিমাণে ব্যায়াম, ভ্রমণ, আসন ইত্যাদি না করা। শীতকালে রজাই বা অতিরিক্ত গরম কাপড় পরিধান করা। মানসিক পরিশ্রম, অধ্যয়ন-চিন্তা অতিরিক্ত করা। অলস ব্যক্তিদের সঙ্গে বসা। সন্ধ্যার মন্ত্রের শব্দার্থ জানা না থাকা। যথাযথ পরিমাণে প্রাণায়াম না করা। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, শ্রদ্ধা, আগ্রহ না থাকা। যোগাভ্যাসের গুরুত্ব বা লাভ বুঝতে না পারা। সাধককে নিজের দিকে লক্ষ্য করতে হবে যে উপরের কোন কারণ তার ওপর প্রযোজ্য। তা বুঝে দূর করতে হবে, যাতে যোগাভ্যাসে সফলতা আসে।

ঈশ্বর উপাসকের লক্ষণ —

১. সমগ্র দিন ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

২. সমস্ত বিশ্ব (নিজের শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সহ) এর স্রষ্টা, পালক, রক্ষক ঈশ্বরকে মান্য করা।

৩. বেদ ও বেদানুকূল ঋষিকৃত গ্রন্থগুলোর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাখা।

৪. ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি (ত্রৈতবাদ) এর স্বরূপ সঠিকভাবে জানা।

৫. সংসারের বিষয় ভোগে চার ধরনের দুঃখ অনুভব করা।

৬. বিষয় ভোগে সুখ গ্রহণ না করা এবং নিজের মন ও ইন্দ্রিয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা।

৭. ঈশ্বর প্রদত্ত উপকরণগুলো ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুযায়ী (ধর্মানুগ) সাধকের রূপে যথাযথ পরিমাণে ব্যবহার করা।

৮. ফলের আশায় না থেকে (তিন এষণামুক্ত) নিষ্কাম মনোভাব নিয়ে কর্ম করা।

৯. ইচ্ছার বিঘ্ন, বিচ্ছেদ, অপমান, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যর্থতা, সুযোগ হারানো ইত্যাদি অবস্থায় চিন্তিত, ভীত, ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত না হওয়া।

১০. সমগ্র সংসারকে ঈশ্বরের মধ্যে নিমজ্জিত দেখার অভ্যাস রাখা।

১১. দৈনন্দিন কাজকর্মে (চিন্তা করা, কথা বলা, নেওয়া-দেওয়া, বোঝা-বোঝানো ইত্যাদিতে) অত্যন্ত সতর্ক থাকা।

১২. আধ্যাত্মিক অজ্ঞানতা (অনিত্য, অশুচি ইত্যাদি) থেকে মুক্ত থাকা এবং জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ থাকা।

১৩. সমস্ত অজ্ঞানতাজনিত সংস্কারগুলো দমন করার ক্ষমতা থাকা।

১৪. যম (নৈতিক নিয়ম) পালন সর্বজনীন মহাব্রত হিসেবে করা, মৃত্যুও আসুক না কেন।

১৫. সর্বদা প্রফুল্ল, সন্তুষ্ট, নির্ভয়, উৎসাহী, পরিশ্রমী এবং আশাবাদী থাকা।

১৬. শরীর, শক্তি, বিদ্যা ইত্যাদি অর্জনের প্রদর্শনী না করা।

১৭. কারো দ্বারা বলা হলে মিথ্যা ত্যাগ করে সত্য গ্রহণ তৎক্ষণাৎ করা।

১৮. ধন, শক্তি, খ্যাতি ইত্যাদি প্রলোভনে আদর্শ ত্যাগ বা আপোষ কখনো না করা।

১৯. বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ কর্ম এবং বিশুদ্ধ উপাসনা এই তিনের সমন্বয় বজায় রাখা।

২০. গম্ভীর, মৌন, একান্তসেবী, সংযমী, তপস্বী হওয়া (বিশেষ করে প্রারম্ভিক সময়ের জন্য)।

২১. দেশ, জাতি, প্রদেশ, ভাষা, মত, পথ, রূপ-রঙ, লিঙ্গ ইত্যাদি বৈষম্য থেকে মুক্ত হয়ে সকলকে ভালোবাসা, সকলের মঙ্গলকামী ও করুণাময় হওয়া।

২২. যোগ দর্শন, উপনিষদ বা অন্যান্য আধ্যাত্মিক গ্রন্থে প্রকাশিত সত্য তত্ত্বগুলো সঠিকভাবে বুঝে তা অনুসরণ করা।

মনের উপর অধিকার করার বিধি

মনের বিষয়ে মানুষ প্রায়ই বলে, "আমার মন তো থামে না, মনেতে অনেক চিন্তা আসে এবং যতই আমি এগুলোকে থামানোর চেষ্টা করি, ততই বেশি চিন্তা আসে" ইত্যাদি। কিন্তু এই সব ধারণা ভুল। বাস্তবতা হলো, মন এক জড় বস্তু যেটি জড় প্রকৃতির তৈরি, এটি সচেতন নয়। তাই এই মনের মধ্যে নিজের থেকে কোনো চিন্তা আসে না, এবং এটি নিজে কোনো চিন্তা তোলে না। এই জড় মনকে চালিত করে সচেতন জীবাত্মা। যখন জীবাত্মা তার ইচ্ছায় কোনো ভালো বা খারাপ চিন্তা মনের মধ্যে তুলতে চায়, তখনই সেই বিষয়ে সম্পর্কিত চিন্তা মনে উৎপন্ন হয়।

যেমন সাউন্ড রেকর্ডার (Tape) বিভিন্ন ধরনের শব্দ সঞ্চিত থাকে, তেমনি মনের মধ্যেও নানা ধরনের চিন্তা সংস্কারেরূপে সঞ্চিত থাকে। যখন ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় Tape চালায়, তখন শব্দ শোনা যায়, নিজের থেকে শব্দ শোনা যায় না। একইভাবে যখন জীবাত্মা মনের সঞ্চিত সংস্কারগুলোকে তার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় তোলে, তখনই মনে চিন্তা উৎপন্ন হয়। এটাই মনের কাজ করার একটি পদ্ধতি।

এছাড়াও মনকে একটি ক্যামেরার মতো ভাবা উচিত। যেমন ফটোগ্রাফার তার ইচ্ছায় যেই বস্তুটির ছবি তুলতে চায়, সেই বস্তুটির ছবি লেন্সের মাধ্যমে ক্যামেরার বাটন চাপিয়ে তুলে নেয়। আর যেই বস্তুটির ছবি তুলতে চায় না, তার ছবি তোলে না। ঠিক তেমনি জীবাত্মা যেই বস্তুটির জ্ঞান লাভ করতে চায়, সেই জ্ঞান মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত করে। এই দৃষ্টান্তে শরীর ক্যামেরার মতো, ফটোগ্রাফার সচেতন জীবাত্মা, মন রিল, যেখানে ছবি ওঠে, আর ইন্দ্রিয় লেন্সের মতো। ঠিক যেমন স্কুটার, গাড়ি, পাখা, মেশিন ইত্যাদি জড় যন্ত্র সচেতন মানুষ ছাড়া নিজে চলে না বা থামে না, ঠিক তেমনি জীবাত্মার ইচ্ছা ও প্রেরণা ছাড়া জড় মন কোনো বিষয়ের দিকে নিজে যায় না, না তার চিন্তা করে।

অজ্ঞানতার কারণে সচেতন জীবাত্মা নিজেকে মনের চালক মনে না করে, মনেরকেই বিষয়গুলোর তোলে (তাদের চিন্তা করে) ভাবতে থাকে। যখন জীবাত্মা তার সচেতনতা ও কর্তৃত্বের এবং মনের জড়তা ও উপকরণের জ্ঞান পেয়ে যায়, তখন সে মনকে নিজের অধীনে রেখে ইচ্ছামতো চালায়। জ্ঞানী যোগী ব্যক্তির জ্ঞান সঠিক হওয়ায় সে নিজের মনকে অধিকারসহকারে ইচ্ছামতো চালায়, যেমন সাধারণ মানুষ নিজের ইচ্ছামতো অধিকার সহকারে স্কুটার চালায়।

যেমন কোনো নতুন স্কুটার চালক বলে, "আমার স্কুটার তো খুব দ্রুত চলে, আমি এটাকে থামাতে চাই, কিন্তু এটি থামে না, আমি বাম দিকে চালাতে চাই, কিন্তু এটি ডান দিকে যায়, আমি এটাকে রাস্তা ধরে চালাতে চাই, কিন্তু এটি রাস্তার নিচে চলে যায়"—এমন অবস্থায় আমরা বলব যে এই ব্যক্তি স্কুটার চালানো জানে না এবং তার অভ্যাসও নেই। এখানে ভাবার বিষয় হলো, স্কুটার কি নিজের থেকে চলে বা থামে? নিজের থেকে ডান বা বাম দিকে যায়? না, এটি চালকের অভাব। ঠিক তেমনি মনের ক্ষেত্রেও বুঝতে হবে যে জড় মন নিজের কোনো বিষয়ের দিকে যায় না, যেমন স্কুটার নিজের থেকে রাস্তার নিচে যায় না।

যোগাভ্যাসীকে উচিত যে উপাসনার সময় আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই মনে এই সংকল্প করা যে, "আমার মন জড়, এই মনকে চালনা করে আমি সচেতন জীবাত্মা। আমার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা ছাড়া এই জড় মন কোনো বিষয়কে স্পর্শ করে না। এই সময় আমি এটিকে আমার নিয়ন্ত্রণে রেখে শুধুমাত্র ঈশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট করব, অন্য কোনো পার্থিব বিষয়ে মন দেব না।"

এমন সংকল্প করার ফলে মন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য হয়। কিন্তু এই সংকল্প করার পরেও যদি ধ্যানের সময় যোগাভ্যাসী অসাবধানতা ও অজ্ঞতার কারণে মনকে অন্য কোনো বিষয়ে নিয়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে মনকে সেখান থেকে সরিয়ে পুনরায় ঈশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট করতে হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাভ্যাসীকে মনকে অন্য বিষয়ে লেগে থাকা অবস্থায় প্রচেষ্টা করে বারবার সরিয়ে ঈশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট করতে হয়। সময়ের সঙ্গে যখন মন বিষয়ে জ্ঞান এবং অভ্যাস ভালো হয়ে যায়, তখন ব্যক্তির মন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং সে সহজেই মনকে যেকোনো বিষয় থেকে সরিয়ে দিতে পারে এবং যেকোনো বিষয়ে নিবিষ্ট করতে পারে।

।। সমাপ্ত ।।